আবার কবে বসবে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স বৈঠক

মোস্তাফা জব্বার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রথমবার সরকারে এসে গঠন করেন আইসিটি টাস্কফোর্স। সে আমলেই ১৯৯৭ সালে তৈরি করা হয় ৪৫ দফা সুপারিশসম্পন্ন জেআরসি কমিটির রিপোর্ট। সেখানে একটি সুপারিশ ছিল কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করার। সে সূত্রেই ১৯৯৮-৯৯ সালের বাজেটে কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়। জেআরসি কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্সকেও সেই সময় অনেক সক্রিয় অবস্থায় পাওয়া যায়। সেটি ছিল বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সুবর্ণ সময়।

বস্তুত জেআরসি কমিটির রিপোর্টেরই আরও একটি প্রস্তাব ছিল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করার। সে টাস্কফোর্স গঠন করে প্রধানমন্ত্রীকে এর প্রধান করা হয়। একই সাথে টাস্কফোর্সের একটি নির্বাহী কমিটির প্রধান করা হয় মুখ্য সচিবকে। এরচেয়ে শক্তিশালী টাস্কফোর্স আর কি হতে পারে!

এবার যখন নতুন করে সরকার গঠন করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী সেই আইসিটি টাস্কফোর্সের নাম বদলে এর নাম দেন ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স। নাম বদলের প্রধান কারণ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি। সরকারের শাসনকালের সূচনাতেই এই পরিবর্তন করার পর প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে টাস্কফোর্সের একটি সভাও হয়। ২০১০ সালের আগস্টের সেই সভাতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। লক্ষ করি, একটি সভাতেই অনেক পুরনো জঞ্জাল সাফ করে অনেক বিষয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু সেই একটি সভাতেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্সের সভার সমাপ্তি ঘটে। সেই সময় এই কার্যক্রম বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিষয় ছিল। পরে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ভেঙে দুটি মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। এর একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হিসেবে আলাদা বিভাগ হয়। এই নতুন বিভাগই টাস্কফোর্সের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই বিভাগের পক্ষে টাস্কফোর্সকে সক্রিয় করা সম্ভব হয়নি। ২০১০ সালের আগস্টের পর এখন পর্যন্ত সেই টাস্কফোর্সের কোনো সভা হয়নি। কোনো সভা ডাকা বা ডাকার উদ্যোগও নেয়া হয়নি। বিগত প্রায় ছয় বছরে টাস্কফোর্সের ওই একটির বেশি সভা হয়নি।

জানি না, কেনো আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আর একটি সভাও করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন আগেও যিনি আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআইয়ের পিডি ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পিএস ছিলেন। তার সাথে প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক খুবই ভালো। আমার জানা মতে, প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে আগ্রহী। তিনি তার দফতরে এটুআই নামের একটি সংস্থাকে বসিয়ে রেখেছেন। তার কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সভার সময় চাইলে তিনি দেবেন না, এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন। বরং এমনটি হতে পারে, এই মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও আমলারা প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাদের ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরতে চাননি বলে সভা আহ্বান করা হয়নি। হতে পারে, টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে কোনো অনুরোধই করা হয়নি।

অন্যদিকে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির সভা হয়েছে সর্বমোট পাঁচটি। গড়ে একটি করে হিসাব করলে একেবারে ফেলনা বলা যাবে না। যদিও এই সময় ২০টি সভা হলে তার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম, তবুও এটি মন্দের ভালো। তবে ২০১৩ সালের ১৮ জুলাই টাস্কফোর্সের পঞ্চম সভার আগের চতুর্থ সভার তারিখটির কথা মনে পড়লেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ১৮ জুলাইয়ের সভাটি যেখানে পঞ্চম, সেখানে চতুর্থ সভাটি হয় ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২। এর মানে, চতুর্থ সভার ১৭ মাস ৯ দিন পর ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির সভা হয়। মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বেও কেনো প্রায় সাড়ে ১৭ মাস কোনো সভা হতে পারেনি, সেটি বোধগম্য নয়। আবার ১৮ জুলাই ২০১৩-এর পর আজ অবধি কোনো সভা কেনো হয়নি, সেটিও একটি প্রশ্ন। যতদূর মনে পড়ে, ২০১৩ সালে একটি সভার নোটিস দিয়ে সেটি পরে বাতিল করা হয়।

এ কথা বলছি না, ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের একটি মাত্র সভা ও নির্বাহী কমিটির ৩৬ মাসে একটি সভা অনুষ্ঠানের ফলে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। বরং ২০০৯ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটি বাস্তবতার আলোকে একটি সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অনেক কাজই এখনও বাকি। এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তালিকাও ছোট নয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে যদি বছরে অন্তত একটি করে সভা হতো, তবে আরও অনেক কাজ এরই মাঝে সম্পন্ন হতে পারত।

নির্বাহী কমিটিতে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি থাকেন মাত্র কয়েকজন। এ কমিটির প্রধান তিনজন হলেন : বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি, বেসিস ও আইএসপিএবি'র সভাপতি ত্রয়। ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত আমি ওখানে প্রতিনিধিত্ব করেছি। ২০১২-তে ছিলাম না। কারণ, তখন আমি বিসিএসের সভাপতি ছিলাম না। আবার ২০১৩ সালে সভাপতি হিসেবে ১৮ জুলাইয়ের সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই সূত্র ধরেই তুলে ধরছি একটি সভায় নীতি-নির্ধারণ পর্যায়টি কতটা এগোতে পারে তার বিবরণ।

এবার যখন নতুন করে সরকার গঠন করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী সেই আইসিটি টাস্কফোর্সের নাম বদলে এর নাম দেন ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স। নাম বদলের প্রধান কারণ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি। সরকারের শাসনকালের সূচনাতেই এই পরিবর্তন করার পর প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে টাস্কফোর্সের একটি সভাও হয়। ২০১০ সালের আগস্টের সেই সভাতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। লক্ষ করি, একটি সভাতেই অনেক পুরনো জঞ্জাল সাফ করে অনেক বিষয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু সেই একটি সভাতেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্সের সভার সমাপ্তি ঘটে।

চতুর্থ সভার পর্যালোচনার বিষয় ছিল ২৪টি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল : দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, কানেকটিভিটি চার্জ কমানো, সরকারি ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা, ইন্টারনেটের দাম কমানো, কমপিউটার ল্যাব স্থাপন, ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন, ইন্টারনেটের ভ্যাট বাতিল, সাইবার অপরাধ, আইসিটি নীতিমালা হালনাগাদ করা, হাইটেক পার্ক স্থাপনসহ আরও কিছু দাফতরিক বিষয়। সে সবের মাঝে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল।

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল আসছে

সে সভায় জানা গেল, বাংলাদেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল-সিমিউই ৫ আসছে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা দিয়ে। যদিও বরিশাল থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত ৬৫ কিলোমিটার পথে ▸

তখনও ফাইবার অপটিক কানেকশন ছিল না, তথাপি কুয়াকাটাতেই সাবমেরিন ক্যাবল বসছে। ওখানে এরই মাঝে জায়গাও কেনা হয়ে গেছে। অন্যদিকে সভায় বলা হলো, বাগেরহাটের মংলায় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন করা যাবে না। পশুর নদীর নাব্যতার কারণে মেরামতের জাহাজ মংলা বন্দর পর্যন্ত আসতে পারবে না। বিষয়টি নিয়ে আমার যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে, এই সিদ্ধান্তটির পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না। সাবমেরিন ক্যাবলকে মংলা বন্দরেই কেনো আনতে হবে সেটি বুঝি না। কক্সবাজারে তো কোনো বন্দর নেই। সেখানে সমুদ্রসৈকত দিয়ে ক্যাবল ডাঙ্গায় তুলে আনা হয়েছে। কলাতলীতে ছোট একটি ঘের দেয়া জায়গায় সমুদ্র থেকে ক্যাবল এসে ভেসে উঠেছে। বাগেরহাটের সমুদ্রতটে কেনো সেটি করা যাবে না? মংলা বন্দর থেকে সমুদ্র ২২ নটিক্যাল মাইল দূরে হলেও একেবারে সমুদ্রপাড়েই কক্সবাজারের মতো ল্যান্ডিং স্টেশন কেনো করা যাবে না, সেটিও আমি বুঝি না। কেনো সাগরতল থেকে সমুদ্রতটে তার উঠিয়ে ল্যান্ড কানেকশন দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল লাইনটি ঝিলংজার মতো মংলা, বাগেরহাট বা খুলনার কোন স্থানে কেনো নেয়া যাবে না? ওরা এটিও বলেছে, সেখানে নাকি জায়গা পাওয়া যাবে না। এই কথাটি কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। মংলা থেকে ২২ কিলোমিটারের মাঝে ৮/৯ একর জায়গা পাওয়া যাবে না সেটি কি বিশ্বাস করা যায়? আমরা সেদিন জানলাম, দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল লাইন সিমিউই-৫-এ প্রাথমিকভাবে ৭০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ পাওয়া যাবে। তবে সেটি ১৭০০ জিবিপিএসও হতে পারে। এসব বিষয় ১৭ মাস পরে আলোচনা না করে তিন মাস পরপর আলোচনা করলে এর স্বচ্ছতা আরও বেশি থাকত। এমনকি মংলায় কেনো সাবমেরিন ক্যাবল আসবে না, সেটি জাতি আরও অনেক আগেই জানতে পারত। অথচ তা হয়নি। এরই মাঝে বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে এবং সিমিউই-৫ কুয়াকাটাতে আসাই নিশ্চিত হয়েছে। তবে বিষয়টি অন্তত নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

কমপিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো আয়োজন নেই

সেই সভায় জানলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষা চালু করলেও ছাত্র-ছাত্রীরা কেমন করে কমপিউটার ল্যাবে যাবে, তার কোনো অ্যাকশন প্ল্যান নেই। বিস্ময়কর হলেও সত্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিয়ে ভাবেইনি। আমরা যখন বললাম, কমপিউটার শিক্ষাটি শুধু তত্ত্বীয় বিষয় নয় এবং কমপিউটারে না বসে বিষয়টি পড়া যায় না, আর কমপিউটার ল্যাব ছাড়া কমপিউটারে বসার কাজটি হয় না, তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি লা-জবাব হয়ে থাকলেন। আমরা জানি, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল ৩১৭২টি ল্যাব স্থাপন করার পর ২০১৩ সালে মাত্র ৩৪০টি ল্যাব স্থাপন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোনো কমপিউটার ল্যাব স্থাপন করেনি। এ অবস্থায় দেশজুড়ে কমপিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজটি কতটা এগিয়ে যাবে,ত সেটি নিয়ে দেখা দেয় এক বিরাট প্রশ্ন। এসব বিবেচনায় সে সভায় সিদ্ধান্ত হলো সামনের সভায় যেনো শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ল্যাব স্থাপন করার জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান জমা দেয়। জানি না এ সরকারের আমলে পরের সভাটি হবে কিনা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের কোনো অ্যাকশন প্ল্যান জমা দেবে কি না।

বেসরকারি ডিজিটাল কনটেন্টকে উৎসাহিত করা হবে

সেদিনের সেই সভায় একই সাথে আলোচনা হলো ডিজিটাল ক্লাসরুমের ডিজিটাল কনটেন্ট নিয়ে। আমরা জানলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৩ হাজার ৫০০ ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরি করলেও এর পরে কী হবে সেটি তারা জানে না। এমনকি এনসিটিবি তাদের বইগুলোকে কবে সফটওয়্যার বানাবে সেটিও তারা জানে না। সেই সভাতেই সিদ্ধান্ত হলো– বেসরকারি খাত যদি এনসিটিবির পাঠ্যবইকে সফটওয়্যার হিসেবে তৈরি করে, তবে সরকার তাকে বাধা না দিয়ে উৎসাহিত করবে। এনসিটিবির কপিরাইটের দাবিও করবে না বলে সভায় জানানো হয়। এনসিটিবিকে সফটওয়্যার বানানোর কাজে যুক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেই সভার ১৪ মাস পরও তার আর কোনো অগ্রগতি জানা যায়নি।

সাইবার ক্রাইমের জন্য নতুন আইন হবে

সভায় সাইবার ক্রাইম নিয়ে আলোচনা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সবাই একমত হন, বিদ্যমান আইন সাইবার অপরাধ দমনে যথাযথ নয়। সে সভাতেই সিদ্ধান্ত হয় সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ করার জন্য একটি নতুন আইন প্রণীত হবে। যদিও এরই মাঝে আইসিটি অ্যাক্ট সংশোধিত হয়ে গেছে। আমার ধারণা, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় জানত না। সেই সভার ১৫ মাস পরও আইন প্রণয়নে কোনো অগ্রগতির খবর জানা যায়নি।

১৮ জুলাই ২০১৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির পঞ্চম সভায় আগের সভার সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করার পর আলোচনা হয় নতুন আলোচ্যসূচি নিয়ে। মোট ৩৪টি বিষয় আসে সেই আলোচ্যসূচিতে। নতুন আলোচ্যসূচির মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল : আইসিটি নীতিমালা সংশোধন, ইনকুবেটর স্থাপন, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন, বিভাগীয় পর্যায়ে হাইটেক পার্ক স্থাপন, সরকারি নেটওয়ার্কের ব্যাকবোন ও ক্লাউড কমপিউটিং, ইনফো সরকার, ৬৪ জেলায় আইটি ভিলেজ, সরকারি কর্মকর্তাদের স্থায়ী ই-মেইল আইডি চালু, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রচলন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করা, জাতীয় ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণ, সব জেলাকে ডিজিটাল জেলায় রূপান্তর, ইনোভেশন ফান্ড, জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা, ই-ফাইলিং, মোবাইল কনটেন্ট ও ভাস নীতিমালা, ই-কমার্স, লার্নিং ও আর্নিংসহ আরও অনেক বিষয়। এসব বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়েও নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

উপজেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা

উপজেলা স্তরেও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমরা যোগ করি যে তাতে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের প্রদর্শনী অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এর ফলে বিশেষত শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। বিশেষ করে এখন যেহেতু কমপিউটার শেখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং মফস্বলের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই কমপিউটার ল্যাব নেই, সেহেতু এ ধরনের প্রদর্শনী অনেকটাই সহায়তা করবে।

থ্রিজি

৫৮টি বিষয়বস্তু আলোচনার তালিকায় থাকার পরও বস্তুত জরুরি কিছু বিষয় আলোচ্য সূচিতেই আসেনি। থ্রিজি নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু থ্রিজি লাইসেন্স দিতে কেনো বিলম্ব হয়েছে, সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখেও থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া যাবে কি না বা থ্রিজি লাইসেন্সের জটটা কোথায়, সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত ছিল। আমরা লক্ষ করি, থ্রিজি লাইসেন্স দেয়ার বিষয়টি গড়িয়ে গড়িয়ে এই সরকারের বিগত আমলটা পার করে দিয়েছিল প্রায়। বাজারে এমন গুজব আছে, কোনো কোনো মোবাইল অপারেটরের সহায়তায় বিটিআরসির একটি চক্র এমন প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল যাতে এই সরকারের বিগত আমলে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া না হয়। সেসব অপারেটর মনে করছিল, আওয়ামী লীগ আমলটি পার করে দিতে ▸

ভাস নীতিমালা

সভায় ভাস নীতিমালা যে দিনের পর দিন পড়ে আছে সেটি স্বীকার করে এমওপিটি অস্থায়ীভাবে কনটেন্ট ডেভেলপারকে শতকরা ৭০ ভাগ ও মোবাইল অপারেটরকে শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ার দেয়ার বিষয়ে একমত হয়। বিটিআরসি এ বিষয়ে একটি আদেশ দিতেও সম্মত হয়। কিন্তু সেই সভার এত দিন পরও সেই আদেশ দেয়া হয়নি।

আইসিটি নীতিমালা সংশোধন অনিশ্চিত

সভার আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায়, আইসিটি নীতিমালা সংশোধনে স্থবিরতা বিরাজ করছে। মন্ত্রিসভা থেকে নীতিমালাটি ফেরত আসার পর সেটি সংশোধন করে আবার মন্ত্রিসভায় পাঠানো হয়নি। সেটি কীভাবে পাঠানো হবে তা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। আলোচনাদৃষ্টে মনে হয়, সেটির আপডেট প্রায় স্থবির হয়ে আছে। যাই হোক, নতুন আলোচ্য বিষয় হিসেবে এই আলোচনাটিকেও আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। তবে ৩৪টি নতুন বিষয়ের আরও অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে হাইটেক পার্ক স্থাপনের পাশাপাশি জনতা টাওয়ার ও কালিয়াকৈরের দুটি পার্ক নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল। জনতা টাওয়ার বস্তুত আটকে আছে। কালিয়াকৈরের অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়। উচিত ছিল মহাখালীর আইটি ভিলেজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া।

পারলে তাদের লাইসেন্সের দাম কমে যাবে এবং অনেক বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। তবে সুখের বিষয়, অবশেষে বাংলাদেশ থ্রিজি লাইসেন্সের যুগে পৌঁছতে পেরেছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থ্রিজির নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত নতুন অপারেটরদের কেউ কেউ অক্টোবর মাসেই থ্রিজি সেবা দিতে শুরু করে।

ডিজিটাল সরকার

আমরা ২০০৯ সাল থেকেই ইউনিয়ন, উপজেলা বা জেলায় কাগজের প্রশাসনকে ডিজিটাল করার কিছু প্রয়াসের সাথে পরিচিত হয়েছি। ইউনিয়নগুলো তথ্য ও সেবাকেন্দ্র পেয়েছে। উপজেলার প্রশাসন অনেকটাই সচল হয়েছে। জেলার প্রশাসনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু সচিবালয়ে কী হচ্ছে তা কেউ আলোচনা করেন না। আমার জানা মতে, সরকারের কোনো একটি মন্ত্রণালয় তার কাজকর্মকে ডিজিটাল করেনি। এমনকি খোদ আইসিটি মন্ত্রণালয় তার কাজকর্ম এখনও কাগজের ফাইলেই করে।

মেধাস্বত্ব ও পাইরেসি

আলোচ্যসূচিতে মেধাস্বত্ব ও পাইরেসি বিষয়টি ছিল না। আমরা যখন একটি ডিজিটাল যুগের কথা বলছি এবং একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার কর্মসূচি হাতে নিয়েছি, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা করা ও পাইরেসি বন্ধ করা। আমরা লক্ষ করি, পাইরেসি প্রতিরোধে সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। এক সময়ে কপিরাইট রেজিস্ট্রার নিজে পাইরেসি বন্ধ করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেছেন। কিন্তু সেবার ৯ মাসে কপিরাইট বোর্ডের সভাই হয়নি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় প্রায় ঘুমিয়েই সময় কাটিয়েছে। এই মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। লিখিতভাবে কপিরাইট বোর্ডের সভা আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অবশেষে নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের অনেক পরে কপিরাইট বোর্ডের একটি সভা হয়েছে। এমনিভাবে প্যাটেন্ট আইনটি আপডেট করার জন্য বহুদিন ধরে বলা হলেও সেই বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেই। টাস্কফোর্সের দায়িত্ব হলো সেই জটিলতাগুলো নিরসন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া। কিন্তু সেই কাজটি হয়নি। সর্বশেষ উদ্যোগ হচ্ছে কপিরাইট আইন সংশোধন করা। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সেই কমিটির কোনো সভা ডাকা হচ্ছে না।

আমি মনে করি টাস্কফোর্সের একটি সভা হওয়া উচিত শুধু বিটিআরসিকে নিয়ে। বিগত সময়ে বিটিআরসির যে ভূমিকা ছিল, তারা কি সেটি সঠিকভাবে পালন করেছে? তারা কি দেশের প্রায় ১১ কোটি মোবাইল ব্যবহারকারী বা প্রায় ৪ কোটি মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর স্বার্থরক্ষা করতে পেরেছে? ইন্টারনেট সেবার নামে মোবাইল অপারেটরেরা যে গ্রাহকদের পকেট ফতুর করছে, সেই ব্যাপারে তারা কি কোনো ব্যবস্থা নিতে পেরেছে? মোবাইল অপারেটরেরা যে সেবা দিচ্ছে, যেভাবে গ্রাহকদের সাথে চাতুরী করছে, তার কোনো প্রতিকার কি বিটিআরসি করেছে? বিটিআরসি কি ভিওআইপি বন্ধ করার পথে সামান্য সফলতা দেখাতে পেরেছে? থ্রিজি নিয়ে টালবাহানা বা মোবাইল নাম্বার পোর্টেবিলিটি নিয়ে অপারেটরদের চাতুরী নিয়ে কোনো পদক্ষেপ কি তারা নিতে পেরেছে? তারা কি সাইবার ক্রাইম দমনে কোনো পদক্ষেপ নিতে পেরেছে? বিটিআরসিকে কি এসবের জন্য জবাবদিহি করা উচিত নয়?

সেই সভা চলাকালে পুরো সময়টাতে আমি নিজেকে অসহায় ভেবেছি। আমার বারবার মনে হয়েছে, আমলাতন্ত্র একটি দেশের সম্ভাবনাগুলোকে ফিতার মাঝে কব্জা করে এর ভবিষ্যৎকে কি সুন্দরভাবে বন্দী করে রেখেছে। সেই যে ব্রিটিশ আমল থেকে এর ধারাবাহিকতা চলছে, সেটির কবে অবসান হবে। সচিবালয়ের মহাজ্ঞানী মহাজনরা জেলা প্রশাসক ও তার বাহিনীকে ডিজিটাল করার জন্য ধমকের পর ধমক দিচ্ছেন, উপজেলা প্রশাসনকে বাধ্য করছেন ডিজিটাল হতে, অথচ নিজেরা শত বছরের পুরনো পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে বসে আছেন– এর পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ কারও নেই। তাদের ফাইলেই বন্দী পড়ে থাকে মহাখালী বস্তি, কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক, জনতা টাওয়ার এসটিপি। তারাই কখনও ডেস্কটপ, কখনও ল্যাপটপ বা কখনও ট্যাবলেট পিসির প্রেসক্রিপশন দেন। তারাই মেধাস্বত্ব বন্দী করে রাখেন। তারাই ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির কথা ভাবেন না। আমার আরও দুঃখ হয় আমাদের মন্ত্রীদের কথা ভেবে। তারা কেনো তাদের সচিবদেরকে ডিজিটাল করার জন্য সামান্য একটু সামনে নিতে পারলেন না? কেনো ১৭ মাস পরে সভা হলো, সেই প্রশ্ন কারও নেই। কেনো বছরের পর বছর ফাইল মন্ত্রণালয়ে বা দফতরে পড়ে আছে, তার কোনো জবাবদিহিতাও নেই কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com

বদলে দিচ্ছে দুনিয়া

(৩৪ পৃষ্ঠার পর)

নির্মাণের জন্য। এর মাধ্যমে টেলর তখন মাত্র ১৮ বছর বয়সেই হয়ে ওঠে একজন প্রকৃত পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানী। সে এখন কাজ করছে স্বল্পব্যয়ের জ্বালানির পারমাণবিক চুল্লির ওপর। আর এটাই তার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র।

আয়োনুট বুদিস্টিয়ানু

আয়োনুট বুদিস্টিয়ানু হচ্ছে রুমানিয়ান হাই স্কুলের এক ছাত্র। সে উদ্ভাবন করেছে একটি স্বচালিত তথা সেলফ ড্রাইভিং কার। সে লাভ করেছে ৭৫ হাজার ডলারের একটি বৃত্তি। বিশ্বব্যাপী সে আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছে। সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে একটি গাড়ি তৈরি করেছে। এ গাড়িটি গুগলের তৈরি গাড়িগুলোর চেয়েও কম খরচের। তার ডিজাইন করা গাড়ি তৈরি করতে খরচ হয় মাত্র ৪০০০ ডলার, যেখানে একই মানের অন্য ডিজাইনের গাড়ির জন্য খরচ পড়ে ৭৫ হাজার ডলার। এতে বুদিস্টিয়ানু ব্যবহার করেছে পাঁচটি ল্যাপটপ– চারটি রয়েছে রিয়েল টাইম ডাটা কালেকশনের জন্য, আর পঞ্চমটি ব্যবহার হয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য। এসব ল্যাপটপ ব্যবহার করে বুদিস্টিয়ানু একটি প্রোগ্রাম বানাতে সক্ষম হয়, যা ট্রাফিক চলাচল, রোড, পথচারী, বাধা ও অন্যান্য বিষয়ের আকারে ডাটা নিতে পারে একটি কম রেজিস্ট্যান্সের থ্রিডি LiDAR (Light Detection and Ranging) থেকে। এর মাধ্যমে গাড়িটি দ্রুত নিরাপদে চালানো সম্ভব। এ ছাড়া সে এখন একটি বৈপ্লবিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির পথে, যার মাধ্যমে অন্ধ লোকেরা অনায়াসে একা রাস্তায় চলাচল করতে পারবে নিরাপদে

আয়োনুট বুদিস্টিয়ানু

ব্রিটানি উইঙ্গার

একাদশ গ্রেড পড়ার সময়েই ব্রিটানি উইঙ্গার আগ্রহী হয়ে ওঠে কমপিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ব্যাপারে এবং তা প্রয়োগ করে ক্যান্সারে। সে এমন একটি অ্যালগরিদম লেখে, যার ক্যান্সার ডিটেকশন রেট ৯৯ শতাংশের চেয়েও বেশি। তার রিসার্চ প্রজেক্টের নাম 'গ্লোবাল নিউরাল নেটওয়ার্ক ক্লাউড সার্ভিস ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার'। ২০১২ সালে গুগল সায়েন্স ফেয়ারে এ প্রকল্পটি গ্র্যান্ড প্রাইজ জিতে নেয়। ২০১৩ সালের মধ্যে সে তার নিউরাল ক্লাউড নেটওয়ার্ক প্রোগ্রাম আরও এগিয়ে নিয়ে লিউকেমিয়া ডিটেকশনের বিষয়টিও এতে অন্তর্ভুক্ত করে এবং লাভ করে মাল্টিপল অ্যাওয়ার্ড। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইন্টেল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ পুরস্কারটিও। তার প্রোগ্রামটি

ডিজাইন করা হয়েছে বিশ্বব্যাপী বায়োপসিস থেকে অ্যাগ্রিগেট ডাটা ব্যবহারের জন্য, যাতে শেখা যায়– কী করে মানবদেহের ক্যান্সার ও টিউমার চিহ্নিত করা যায়। 'ক্লাউড৪ক্যান্সার' সার্ভিস নামে এটি এখন পরিচিত। এটি বিশ্বব্যাপী পাওয়া যায় নিখরচায়। এর অর্থ বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ রোগী সুযোগ পাবে কম ব্যথার ইনভেসিভ সার্জিক্যাল টেস্টের। আর এর মাধ্যমে অনেক আগেই ক্যান্সার ও টিউমার ধরা পড়বে। অতএব তার এ উদ্ভাবনের ফলে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ রক্ষা পাবে। কজ